দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ঃ কি এবং কেন?

পয়লা জানুয়ারি, ১৯৯২ থেকে আমাদের দেশে একটি এমন আইন কার্যকর হচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব চেয়ে বড় বাধা দূর হবে। তাই জাতির পক্ষে, এটা একটা মহা–আনন্দের দিন, মহান কর্তব্যের আহবান। তবুও অনেকের মনেই এ বিষয়ে কিছু প্রশ্নের উদয় হবে, কিছু যুক্তি এবং তথ্য তারা জানতে চাইবেন। নিচে প্রাসংগিক কয়েকটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর আলোচনা করা হলো। এ বিষয়ে আরো মতামত ব্যক্ত হবে, এই প্রত্যাশায়।

১। প্রশ্ন ঃ দেশের অধিকাংশ লোক মাতৃভাষায় লিখতে এবং পড়তে না জেনেও তো বেঁচে আছে, তাহলে প্রাথমিক শিক্ষায় লাভ কি?

উত্তরঃ প্রাথমিক শিক্ষার ফলে আমরা বাংলা ভাষায় অপরের লেখা জ্ঞানের কথা, মজার কথা, গল্প, সব কিছু পড়েত পারি আর নিজের মনের কথা ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারি। নিজের হিসাব নিজে লিখে রাখতে পারি। এর ফলে আমাদের ক্ষমতা, শক্তি আর নিরাপত্তা অনেক বেড়ে যায়। আধুনিক উৎপাদনের উন্নত কৌশলগুলি জটিল, সেগুলি শুধু মুখে মুখে শিখে স্মৃতিতে ধরে রাখা কঠিন। লিখে রাখা জ্ঞান, একবারে মনে না থাকলে তা আবার পড়ে নিতে পারি। ব্যাংকে টাকা রাখায় তা চুরি ডাকাতির ভয় নাই, কাউকে না জানিয়ে ব্যাংকে হিসাব খুলে নিজের দস্তখতে টাকা জমা রাখা, তুলে নেওয়া, হিসাব করা, এসব সম্ভব হয় প্রাথমিক শিক্ষা থাকলে। সে কালের চাষে গোবর–সার দেয়া হতো, বৃষ্টির আর বর্ষার পানিতে আবাদ হতো, কিন্তু তাতে ফসল হতো কম। এখন রাসায়নিক সার, উন্নতমানের বীজ, পাম্পের পানি, এসবে ফলন বেশি, কিন্তু হিসাব– মত, সময়মত বুঝে নিয়ে সবকিছু করতে হয়। গোবর–সার বেশি দিলে বা কম দিলে সামান্য ক্ষতি হয় কিন্তু রাসায়নিক সার দেওয়ার হিসাব জানতে হবে। ভুল প্রয়োগ হলে অনেক টাকা নষ্ট হবে, ফসল নষ্ট হয়ে যাবে অনেক বেশি। এসব নিয়মের কথা লিখে রাখলে তা সময় মত অনেক পড়ে নেয়া যায়। সেকালে পরিবার পরিকল্পনা করতে হতো না। এখন তা করতে হচ্ছে। কিন্তু মেয়েরা তো ওষুধ–পত্রের গুনাগুন, যন্ত্রপাতির ব্যবহারবিধি সকলের সাথে প্রকাশ্যে আলাপ করতে পারে না। লেখা জিনিস গোপনে নিজের উচ্ছা মত পড়ে, নিরাপদ হতে পারে। আন্দাজের উপর নির্ভর করতে হয় না। তাই আমাদের আর যাই হোক, প্রাথমিক শিক্ষা থাকলে আমাদের বেঁচে থাকার আনন্দ অনেক বেশি। আমাদের জীবন ধারণের, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার সুবিধা অনেক বেশি।

২। প্রশ্নঃ আপনি যে বললেন, প্রাথমিক শিক্ষা থাকলে আমাদের বেঁচে থাকার আনন্দ অনেক বেশি, দরিদ্র সাধারণের জন্য তো টাকাটাই আনন্দ লাভের উপকরণ, সাক্ষরতা কি করে টাকার বা বিত্তের স্থান নেবে?

উত্তর ঃ তাহলে এ সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এক সময়ে জাপানে পড়াশুনা করতাম। সেখানে আমার বাসার কাছেই ছিল শিবুইয়া রেল ষ্টেশন। প্রত্যহ কার্যস্থলে যাবার জন্য ট্রেনে ওঠার আগে দেখতাম এক তরুণ দম্পতি পথের দুই পাশে বসে জুতো সারার কাজ করে। যখনই তাদের হাতে কাজ থাকতো না, দেখতায় দুটো জাপানী পত্রিকা হাতে নিয়ে তারা মুখ গুঁজে বসে পড়ছে। এক জাপানী বন্ধুর সাহায্যে একদিন তাদের সাথে আলাপ করলাম। এরা শুধু প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু দুজনেই খুব কৌতূহলী আর জ্ঞান পিপাসু। তাদের জুতো মেরামতের কাজ কখনো থাকে, কখনো থাকে না। অতঃপর সময়টা তারা নানা ধরনের গল্প, প্রবন্ধ, কাব্য ইত্যাদি পড়ে, আর সেগুলি নিয়ে আলোচনা করে। তারা যে কাজ করে তাতে তাঁদের সংসার খুব সচ্ছল নয়, কিন্তু মনের দিক দিয়ে তারা একজন জমিদারের চেয়ে কোন অংশেই কম প্রফুল্ল বা দরিদ্র নয়! মেয়েটি বলেছিল, জীবন তো একবারই এসেছে, যদি জ্ঞানের চর্চা করতে পারি, যদি ক্ষুধার সময় দু'মুঠো খেতে পাই, যদি শরীর সুস্থ থাকে তবে তো মানব জন্মে যা সবচেয়ে ভাল, তার সবই পেলাম। তাদের চমৎকার ব্যক্তিত্বে আমি অবাক হয়েছিলাম–আমাদের দেশের দরিদ্রদের যদি বাংলা ভাষায় লেখা উপন্যাস, হাসির গল্প, স্বাস্থ্য কথা, ইত্যাদি পড়ে তাদের কাজের ফাঁকটা ভরিয়ে তুলতে দেয়া যেতো, তাহলে একজন রিক্সাওয়ালা বা একজন ছোট দোকানদারের জীবনও অনেক পরিপূর্ণ হতো। উল্লেখ্য যে জাপানের সরকার সেই মেইজী পূনরুত্থানের (টনধ / ীগ্রমরটধমভ) সময় ১৮৭৪ সনে সারাদেশের জন্য পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। তখন জাপানে পুরুষদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র শতকরা ৩০ জন, বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থাও প্রায় তাই। এখন জাপানে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর পাওয়া যাবে না। বর্তমানে এশিয়ার দেশ হলেও জাপানের মাথা পিছু আয় ইউরোপ–আমেরিকার দেশগুলির অনেকের চেয়ে বেশি।

৩। প্রশ্নঃ যাদের ইচ্ছা তারা তো ছেলে মেয়েদের এখনো লেখা পড়া শিখাচ্ছে, কিন্তু বাধ্যতামূলক কেন করা হচ্ছে? এতে গরিবদের অসুবিধা হবে না কি? ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হচ্ছে না কি?

উত্তরঃ দেখা যায়, যে সব পিতা–মাতা নিজেরা লিখতে পড়তে জানে, তারা জানে, যে অন্ততঃ ৫ বছর না পড়লে বাংলায় লিখতে পড়তে পারা যায় না–আর ছোট বয়সে শিখবার ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। মা যে ভাষাতে কথা বলে ছেলে–মেয়েরা কোন ব্যাকরণ না জেনেও তা বুঝতে আর বলতে পারে। লেখা এবং পড়ার ক্ষমতা আমাদের তৃতীয় চক্ষুর কাজ করে যে নিরক্ষর সে এই দুনিয়াটার অনেক কিছুই দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না। অনেক সত্যই নিরক্ষরের চোখে দেখা যায় না। লেখা পড়লে, তবেই জানা যায়। তাই শিক্ষিত পিতা–মাতারা নিজের কষ্ট হলেও তাদের প্রিয় সন্তানদের স্কুলে পাঠান। কিন্তু পিতা–মাতার উভয়ই যখন নিরক্ষর, তারা তো জানেই না, লেখা পড়ার কি ক্ষমতা, এতে কি মজা। আর এদের যদি ছেলে–মেয়েকে ৫ থেকে ১০ বছর, এই টুকু সময় স্কুলে পাঠাতে বাধ্য না করা যায়। তবে পুরুষানুক্রমে তাদের বংশধররা নিরক্ষরই থেকে যাবে। তারা চিরকালই দরিদ্র এবং দুর্বলই থেকে যাবে। যে নিজের সন্তানের ভাল বুঝতে পারছে না, আমরা সকলেই চাপ সৃষ্টি করলে তখনই সেই নিরক্ষর পিতা–মাতা সন্তানদের স্কুলে পাঠাবে। ইনজেকশন দিলে ব্যথা লাগে, কিন্তু ঐ অল্প ব্যথা না দিলে পরে অনেক বড় ব্যথার অসুখ আর ভোগান্তি হবে–তাই আমরা কষ্টকর হলেও ইনজেকশন নেই। এটাও সেই রকম। এতে গরিবদের কোন প্রকৃত অসুবিধা হতে পারে না, কারণ ৫ থেকে ১০ বৎসর বয়সের ছেলে মেয়েরা তো শিশু তারা কি কাজ করতে পারে? এমন কি জন্তু জানোয়ারও তাদের শিশুকে কাজ করতে দেয় না। বাচ্চারা মায়ের আশ্রয়ে থাকে, দুধ খায়। মুরগীর বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত মা সর্বদা সাথে করে রাখে যাতে বাজ পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে না যায়। গাছের বেলাতেও দেখা যায়। ছোট সময়ে নারিকেল বা সিমের চারার খাবার তার বীজের মধ্যেই থাকে। আমরা মানুষরা কি এ থেকে শিক্ষা নেব না?

৪। প্রশ্নঃ আমাদের দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এমনিতেই এখন এক দুরবস্থা তাতে সব ছেলে–মেয়ে ভিড় করলে তো আরো অসুবিধা হবে। এখন এই সমস্যার কিভাবে মোকাবিলা করা যাবে?

উত্তরঃ ১৯৭৩ সনের আগে প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রামের উৎসাহী এবং ধনী লোক, ইউনিয়নের নেতা, এরাই প্রতিষ্ঠা করতেন, এরাই দেখাশুনা করতেন সরকার কিছু কিছু সাহায্য আর নিয়ন্ত্রণ করতেন। তখন স্কুলের ঘর না থাকলে সবাই চাঁদা দিয়ে ঘর তুলে দিতেন। এখন, সব দায়িত্ব সরকারের ঘাড়ে পড়েছে,

দৈনিক বাংলা

তারিখ 2-0 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

যদিও দেড় কোটি শিশুর জন্য ঐটা একটা ভাল ব্যবস্থা নয়। এককালে বরিশাল জেলায় শিক্ষার জন্য দরদী মহান স্বেচ্ছাসেবকরা শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই এখনো বাংলাদেশের মধ্যে সেই অঞ্চলে নিরক্ষরের সংখ্যা সবচেয়ে কম। প্রাথমিক স্কুলের জন্য ঘর বানাতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা লাগাবেনা, ধনীর অট্টালিকা না হতে পারে, কিন্তু সাধারণ ঘর, চেয়ার বেঞ্চ এসব আমরা ইচ্ছা করলে নিজেরাই বানাতে পারবো। এখন ভাল–মন্দ মিলে দেশে প্রায় ৪১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে–বাকিগুলো ক্রমশঃ আমরা বানিয়ে নিতে পারবো, যাতে করে প্রতি ২ বর্গ কিলোমিটারে অন্ততঃ এমন একটা স্কুল থাকে, যেখানে প্রাথমিক ক্লাসে সীট নাই, একথা বলা হবে না। সমস্যার মোকাবিলা কখনো আপনি থেকেই হয় না, কিন্তু এটা এমন একটা সমস্যা, যার সমাধান অসম্ভব কিছু নয়। ইংল্যান্ড, জাপান, বার্মা, কোরিয়া, সকলেই বহুকাল আগেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। আমরাও চেষ্টা করতে পারি, যাতে সরকারের এই মহান আইনটা বাস্তবায়ন হয়, কার্যকর হয়।

৫। প্রশ্নঃ এই আইন ভংগকারীকে তো শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু শাস্তির ভয়ে কি কেউ চুরি, ডাকাতি, বিবাহে যৌতুক নেওয়া, এসব বন্ধ রেখেছে? তাহলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন করে লাভ হলো কি?

উত্তরঃ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াটা যদি একটা ভাল কাজ বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে এটা পিতামাতার জন্য আইনতঃ বাধ্যতামূলক করাই দরকার একথা ঠিক যে অন্যান্য আইন এখন অনেক সময় ভংগ করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও আইন আছে বলেই এখন আমরা আইন ভংগকারীকে শাস্তির ভয় দেখাতে পারি। প্রকাশ্যে তার নিন্দা করতে পারি। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানদের ইস্কুলে না দিয়ে তাদের ক্ষতি করছে এবং দেশের ক্ষতি করছে, তাদের জন্য আইন থাকলে অন্ততঃ তাদের ধিক্কার দেওয়া যাবে। কেউ কেউ ঐ আইন ফাঁকি দিতে পারে বটে, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যের কারণেই আইন খেলাপকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসবে। আইন না থাকলে তার বিবেকের দংশন সহজে হবে না।

৬। প্রশ্নঃ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে সরকারের উচিত ছাত্রদের জামা কাপড়, বই খাতা, নাস্তা, এসব বিনামূল্যে দেওয়া। আমাদের সরকারের সেই অর্থ কোথা থেকে আসবে? তা ছাড়া স্কুলে না গেলে তো তারা বাড়ীতে কাজ করে কিছু আয়ও করতে পারে।

উত্তরঃ সরকারের কোন পৃথক অর্থ ভান্ডার নাই। ট্যাক্স আদায় করে, তা দিয়েই সরকারের খরচ চলে। জনসাধারণের আয় কম হলে সেই কারণেই সরকারের আয়ও কম হয়। কিন্তু ৫ থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে–মেয়েদের খাদ্য এবং বস্ত্র জোগানোর দায়িত্ব পিতা–মাতার এটা কোন ধনী দেশেও সরকার দেয় না। প্রত্যেক এলাকার অতিদরিদ্র এবং এতিম শিশুদের জন্য যদি খাদ্য–বস্ত্রও কিছু দিতেই হয়। স্থানীয় জনসাধারণেরই সেই দায়িত্ব। তাতে দুর্নীতির সম্ভাবনা কম এবং এই অনুদানের সুফলও ঐ এলাকাবাসীরাই পাবেন, সকল মানুষের উন্নত জীবন–মান লাভের মাধ্যমে। একবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভিয়েতনামের প্রাথমিক স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। তাদের প্রশ্ন করলাম ছাত্র–ছাত্রীদের খাদ্য এবং বস্ত্র কি সরকার দেয়? উত্তরে তারা জানিয়েছিল, মাত্র ৪ ঘন্টার জন্য প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীদের থাকতে হয়। মায়েরা খাইয়েই তাদের নিয়ে আসে, স্কুল শেষে বাড়ী গিয়ে আবার খেতে পায়, বস্ত্রের প্রয়োজন শিশুদের অপেক্ষাকৃত কম। তারা সাধারণ পোষাক যা বাড়ীতে পরিধান করে, তাতেই ক্লাসে আসে–অবশ্য যারা একেবারে দরিদ্র, তাদের জন্য স্থানীয় দাতব্য সংগঠনগুলি কিছু ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় ছোট ছেলেমেয়েদের যেটুকু বস্ত্রের প্রয়োজন তা ঐভাবেই আসেত পারে। ৪ ঘন্টা স্কুলে থাকার পরও দিন রাত্রির ২০ ঘন্টা তারা পরিবারের কাজেই থাকবে, তাই ঐ ২০ ঘন্টায় তারা বিশ্রাম, নিদ্রা এবং পারিবারিক কাজেও সাহয্য করতে পারে। আসল কথাটা এই যে মানুষের ভবিষ্যতের অর্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষ। সেই শিক্ষা থেকে যে পিতা–মাতা তাদের বঞ্চিত করতে চায়, তারা তাদের উপকার না করে বরং শত্রুর কাজই করছে। বস্তুতঃ যারা স্কুলে আসে না এমন ছেলে–মেয়েদের অনেক পরিবারে আমি গিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপার্জন করাটা তেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবে এমনটা কমই ঘটবে, দায়ে পড়লে মানুষ অনেক কাজই করতে পারে। নিরক্ষর পিতা মাতা সেই দায়টা বোধ করে না। অবশ্য মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর অসুবিধার কথা অনেকে বলেছে, যেটা হাইস্কুলের বেলায় অধিক বোধগম্য, কিন্তু এ জন্য সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ আর নিরাপত্তার সুযোগ বাড়ানো উচিত এবং তা করাও হচ্ছে।

৭। প্রশ্নঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক এবং জনপ্রিয় করতে হলে আমাদের কি করা উচিত?

উত্তরঃ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ৩১শে ডিসেম্বরের (১৯৯১) বক্তৃতায় যে কথাটা বলেছেন, সেটাই আমি আবার উল্লেখ করবো। অনেক বড় এবং কঠিন কাজই অর্থের দ্বারা হয়না, কিন্তু সবাই মিলে চেষ্টা করলে তা হয়। এই কঠিন এবং বিশাল কাজের জন্য দেশব্যাপী আমাদের একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যারা এখন এর সুফল বুঝতে পারছে না, তাদেরকে বুঝাতে হবে, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সম্মান করতে হবে। তাদের কাজে সকলের সহযোগিতা দিতে হবে। স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সরকার দিচ্ছেন, কিন্তু নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, স্কুলের মান উন্নত করার জন্য যে খরচ, তা আমাদের স্বেচ্ছায় এলাকা ভিত্তিকভাবে চাঁদা দিয়ে চালাতে হবে। ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরানের প্রথম আদেশ, "পড় তোমার আল্লাহর নামে।" এই আদেশ পালনের জন্য যাদের বিত্ত নাই, তাদেরকে যাদের বিত্ত আছে, তারা যদি সাহায্য দেয়, স্কুল ঘর মেরামতের জন্য সাহায্য দেয়, শ্রম দান করে, তা হলে তা সর্বোচ্চ দান–অর্থাৎ সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে। এই বিধানটা আমরা ভুলে গিয়েছি বলেই বর্তমানে মুসলিম প্রধান দেশগুলিতেই মাতৃভাষায় নিরক্ষরতা সর্বাধিক–এই কারণেই আমরা অর্থনীতির আধুনিকায়নেও পশ্চাদপদ হয়ে আছি। পয়সায় যা করা যায় না, মানুষের ঐকান্তিকতায় তা করা সম্ভব। আমাদের মধ্যে যারা অবসরপ্রাপ্ত বা অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁরা যদি গ্রামে–গঞ্জে এই আন্দোলনের পক্ষে দুটো বক্তৃতা দেন, স্কুলের পরিবেশকে আকর্ষণীয় করার জন্য যদি কিছু শ্রম দান করেন, যারা স্কুলে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে যারা অতি দরিদ্র, নিরাশ্রয় তাদের যদি কিছু খাদ্য, কিছু বস্ত্র, দু'টো উৎসাহের কথা শুনানো হয়, তবে এই আন্দোলন সাফল্যের দিকে যাবে। বিগত ৪০ বৎসর এই দেশে সকল শিক্ষা কমিশন, অনেক মহান ব্যক্তিই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবী করেছেন। আজ যখন সরকার আইনটা বাস্তবায়ন করতে অগ্রসর হয়েছেন, তখন তাঁদের সকলভাবে সাহায্য করা আমাদের দেশ–প্রেমের দায়িত্ব, ধর্মীয় কর্তব্য এবং এই দেশকে কুসংস্কারমুক্ত শক্তিশালী বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এক অপূর্ব সযোগ। আমাদের উচিত রাজনৈতিক মত পার্থক্য ভুলে অন্ততঃ এই একটি আন্দোলনের সহায়তায় নিজেদের ক্ষমতা এবং সময় দেওয়া। যারা নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য করে, খোদাও তাদের সাহায্য করেন।

—অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ ফারুক